অধ্যায় ৩: অনুবাদ চর্চা ও বাংলা সাহিত্য

বিন্যাসক্রম

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৩.২ পরিচয়
৩.৩ অনুবাদ চর্চার ইতিহাস
৩.৪ বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় অনুবাদ
    ৩.৪.১ রামায়ণ
    ৩.৪.২ মহাভারত
    ৩.৪.৩ ভাগবত
৩.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৩.৬ অতিরিক্ত পঠন
৩.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৩.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি—

- অনুবাদ সাহিত্যের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানবেন।
- অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- বাংলায় প্রতিনিধিস্থানীয় অনুবাদ তথা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ প্রসঙ্গে অবগত হবেন।

৩.২ পরিচয়

আমরা সকলেই জানি, মধ্যযুগের আদিপর্বে তুর্কি সেনার আক্রমণে গৌড়ভূমি বিপর্যস্ত হয়েছিল। একদিকে নির্বিচার, নির্যাতন, পীড়ন-তাড়ন, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলতে থাকলে এবং অন্যদিকে ইসলাম ধর্মান্তরীকরণে জোরজবরদস্তির ফলে কৌলীন্যপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা দোষে বহুধাবিভক্ত উচ্চ-নিম্নবর্ণের বাঙালি সমাজের মূলে কুঠারাঘাত পড়েছিল। তখন বাঙালির হৃদয়ে একদিকে ছিল বাঁচবার প্রেরণা এবং অন্যদিকে ছিল প্রাণরক্ষার তাগিদ। এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের গ্রাস থেকে দেশ, সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঐক্যবন্ধন এবং ভাবসংহতি

একান্ত দরকার ছিল। যার জন্য দরকার ছিল পৌরাণিক সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আদর্শকে লোকসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। এই নতুন দায়িত্ববোধ ও সমাজচেতনা জাগার ফলে লোকসাধারণের জন্য সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থ তথা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ হতে থাকে।

মধ্যযুগের বাঙালির এমন কোন সামর্থ্য ও শক্তি ছিল না, যা দিয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বহিরাগত আক্রমণের প্রতিরোধ করবে। ফলে সেই সময়ে বাঙালিরা পরাভূত মনোভাব কাটিয়ে উঠবার জন্য উচ্চ জীবনাদর্শ প্রচারের উপায় হিসেবে অনুবাদ সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে। এই অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান কথা ছিল- ক) গার্হস্থ্য জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, খ) নির্বিবাদ শান্তির অভয় আশ্রয় প্রদান এবং গ) ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা।

৩.৩ অনুবাদ চর্চার ইতিহাস

মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের চাহিদা ছিল একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা, উপদ্রপহীন ভাবে জীবন নির্বাহ করা এবং ধর্ম-কর্মে মন স্থির রাখা। সংস্কৃত কাব্য-মহাকাব্য এবং পুরাণ অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা অনুবাদ সাহিত্য উচ্চতর মর্যাদা লাভ করে। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।

বাংলায় গুপ্তযুগ থেকেই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও পৌরাণিক সংস্কারের ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মালম্বী হয়েও পুরাণ, মহাকাব্য, আর্যশাস্ত্র-সংহিতার প্রতি অনুকূল ছিলেন এমনকি রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করা ব্রাহ্মণকে তাঁরা ভূমিদান করে সম্মানিত করতেন। খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলমান শাসন কিছুটা শান্তমূর্তি ধারণ করলে পুনরায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা বইতে থাকে। তাতার-তুর্কি-খোরাসানি-পাঠান মুসলমানেরা প্রথম দিকে এ দেশে শাসন করলে ক্রমে ক্রমে তারাও এ দেশের ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে ভালোবেসে ফেলেন। অনেক পাঠান সুলতান আবার কৌতুহলবশত হিন্দু কবি ও পণ্ডিতদের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনতে চাইতেন।

শোনা যায়, রুক্নুদ্দিন বরবক শাহ্ কুলীন গ্রামের মালাধর বসুকে ভাগবত রচনার জন্য 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। আবার চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান এবং তাঁর ছেলে ছুটি খান হিন্দু সভাকবিদের দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করান। এই অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ছিল—

- মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবনকে নতুনভাবে ও নতুন আদর্শে গড়ে তোলা।
- হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করা।
- দুশো বছরের পাঠান শাসনকালে বাংলার হিন্দু সমাজে যে ভাঙন ধরেছিল, তা পুনরায় ফিরিয়ে আনা।
- এ দেশের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে মিলন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। অনুবাদ চর্চার ইতিহাস লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৩.৪ বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় অনুবাদ

বাঙালি সমাজের পুনর্গঠনের জন্য এমনকি বাঙালি ঐতিহ্যের সর্বভারতীয় প্রাণধারার সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ প্রয়োজন ছিল। অবশ্য লক্ষণীয়, বাংলার অনুবাদ সাহিত্যে হুবহু আক্ষরিক অনুবাদের রীতি খুব বেশি একটা গৃহীত হয়নি। কবিগণ মূল গ্রন্থকে সংক্ষেপে নিজের ভাষায় পয়ার ত্রিপদীতে রচনা করেছেন। ফলত স্বল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ খুব সহজেই পৌরাণিক ঐতিহ্য ও তার ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। তাই বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পূর্ণ পরিণতির জন্য অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা এতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় অনুবাদ তথা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের কথা আমরা সকলেই জানি। রামায়ণের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস ওঝা, অদ্ভুত আচার্য, চন্দ্রাবতী, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামানন্দ ঘোষ, জগদ্রাম, রঘুনন্দন গোস্বামী; মহাভারতের ক্ষেত্রে কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয়, নিত্যানন্দ ঘোষ, কাশীরাম দাস; ভাগবতের ক্ষেত্রে মালাধর বসু, ভাগবতাচার্য রঘুনাথ, মাধবাচার্য, দুঃখী শ্যামদাস প্রমুখের অবদান অন্যতম।

৩.৪.১ রামায়ণ

কৃত্তিবাস ওঝা

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যধারার পথপ্রদর্শক তথা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ভগীরথ হলেন কৃত্তিবাস ওঝা। রামায়ণের অমৃত রসধারাকে সংস্কৃতের জটিল জটাবন্ধন থেকে মুক্ত করে বাঙালির মহাকাব্য রসতৃষ্ণাকে চরিতার্থ করেছেন তিনি। তাঁর 'শ্রীরাম পাঁচালী' অসামান্য রচনাগুণের জন্য আজ বাঙালির ঘরে ঘরে বিদ্যমান এবং সমাদৃত হয়ে আছে। কৃত্তিবাস ওঝা সম্পর্কে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মন্তব্য যথার্থই উল্লেখযোগ্য—

'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলংকার।'

দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে উদ্ধৃত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর মধ্যে আছে-

'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (পূর্ণ) মাঘ মাস।

তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।'

শ্লোক অনুযায়ী মাঘ মাসের রবিবারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কবি জন্মগ্রহণ করেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষ গণনার দ্বারা বলেন, ১৪৩২ খ্রি. ১২ই ফেব্রুয়ারি রবিবার রাত্রিতে কবির জন্ম। অন্যদিকে গোপাল হালদার মনে করেন, ১৩৯৮ নয়, বরং ১৪০৩ খ্রি. কবির জন্ম। আবার অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন, কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছে ১৪৪৩ খ্রি. ৬ই জানুয়ারি রবিবার। জানা যায়, কবি নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কবির পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল পূর্ববঙ্গ, সেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় তাঁরা নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় বসবাস করেন। নরসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর, তাঁর পুত্র মুরারি ওঝা। মুরারির সাত পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বনমালী ওঝা। এই বনমালী ওঝা এবং মালিনীর পুত্র কৃত্তিবাস ওঝা। কবিরা ছয় ভাই এবং এক বোন। কবির পারিবারিক উপাধি 'মুখোপাধ্যায়' হলেও 'ওঝা' উপাধিতেই বেশি পরিচিত।

আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায়, এগার-বার বছর বয়সে বিদ্যার্জনের জন্য কবি গঙ্গানদী পার হয়ে উত্তরে গুরুগৃহে যাত্রা করেন। শিক্ষা শেষ করে তিনি রাজপণ্ডিত হওয়ার অভিপ্রায়ে গৌড়ের রাজসভায় উপস্থিত হন—

'রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।

পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে।।'

সরস্বতীর কৃপায় কবি নিজের লেখা শ্লোক আবৃত্তি করে গৌড়েশ্বরকে মুগ্ধ করেন। রাজা কবিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে রাজসভার কবির আসনে বরণ করে নেন। পরে এই গৌড়েশ্বরের আদেশ ও নির্দেশেই কৃত্তিবাস 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন। সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত (আদিকাণ্ড/বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড) এবং ২৪,০০০ শ্লোক সমন্বিত এই মহাকাব্য সমগ্র ভারতাত্মার প্রতীকরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

রচনার উৎকর্ষেই বাল্মীকির মহাকাব্য কালজয়ী হয়েছে। বাল্মীকি সর্বপ্রথম উপকথাগুলিকে নিজের অপার্থিব প্রতিভার দ্বারা মহাকাব্যে উন্নীত করেছেন, তাই তাঁকে আদি কবি বলা হয়। প্রথম যুগে রামায়ণ ছিল যুদ্ধবিগ্রহের কাব্য, রামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজকুমার; কিন্তু পরে তাঁকে দেবতার পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ অনুবাদের মধ্যে কম্বনের তামিল অনুবাদ, তুলসীদাসের হিন্দি রামায়ণ 'রামচরিতমানস' এবং বাংলা কৃত্তিবাসি রামায়ণ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কৃত্তিবাস ওঝার রচিত রামায়ণ কাব্যকে ড. সুকুমার সেন 'শ্রীরাম পাঁচালী' বলেছেন। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'রামায়ণ পাঁচালী'। শ্রীরামপুর খ্রিস্টান মিশনের প্রেস থেকে ড. উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে ১৮০২-১৮০৩ খ্রি. মধ্যে কৃত্তিবাসি রামায়ণ কয়েক খণ্ডে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।

কবি কৃত্তিবাস সহজ সরল বাংলা পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে বাল্মীকি রামায়ণের মূল কাহিনিটিকে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। কবি তাঁর কাব্য রচনার পেছনে দুটি কারণের কথা বলেছেন – ক) পৃষ্ঠপোষক রাজার আদেশ, খ) লোকশিক্ষার সামাজিক দায়িত্ববোধ। বাল্মীকির মূল রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালীর কাহিনি ও চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। মূলের রামায়ণ ছাড়াও কবি 'জৈমিনি ভরত', 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'দেবী ভাগবত', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'পদ্মপুরাণ' প্রভৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। মূলের যে সব কাহিনি কবি পরিত্যাগ করেছেন, তাঁর মধ্যে অন্যতম হল-

কার্তিকের জন্ম।
বিশ্বামিত্র কথা।
বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ।
অম্বরীশ যজ্ঞ।
রামচন্দ্র কর্তৃক আদিত্য হৃদয় স্তব পাঠ। ইত্যাদি

আবার দেখা যায়—

- বাল্মীকির বালকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডের নাম কৃত্তিবাসে হয়েছে আদিকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড।
- বাল্মীকির রাবণ মনে প্রাণে রামের শত্রু, কিন্তু কৃত্তিবাসের রাবণ প্রকারান্তে রামভক্ত। মৃত্যুকালে তাঁর মুখে রামের স্তুতি শোনা যায়।
- মূল রামায়ণে রামচরিত্র বীর, অন্যদিকে কৃত্তিবাসি রামায়ণে ভক্তের ভগবানে পরিচিত হয়েছেন।
- ক্ষত্রিয়বধূ সীতা হয়েছে সর্বংসহা বাঙালি কুলবধূ।
- বাল্মীকি যেখানে আর্যধর্ম ও তার সংস্কৃতির দিক তুলে ধরেছেন, কৃত্তিবাস সেখানে ভক্তিবাদ ও বাঙালি সংস্কৃতিকেই রূপ দিয়েছেন। হনুমানের রঙ্গরস প্রভৃতি বাঙালি সংস্কৃতির পরিচায়ক।
- বাল্মীকির লক্ষ্য ছিল রামায়ণকে ভারতীয় আদর্শে সামগ্রিক রূপ দেওয়া, অন্যদিকে কৃত্তিবাসের আদর্শ ছিল বাঙালির উপযোগী চরিত্র ও মনুষ্যত্বের আদর্শকে বাঙালির কাছে জনপ্রিয় করে তোলা।

প্রাক্-চৈতন্য যুগে কৃত্তিবাস রামায়ণ পাঁচালীর শ্রেষ্ঠ কবি। অন্যদিকে সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণের অনুবাদক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—

- অদ্ভুত আচার্য (নিত্যানন্দ)।
- চন্দ্রাবতী।
- দ্বিজ হরিচরণ।
- ষষ্ঠীবর সেন।
- গঙ্গাদাস সেন।
- ভবানী দাস।

- দ্বিজ দুর্গারাম।
- শিবচন্দ্র সেনে।

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণের অনুবাদক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—

- শঙ্কর কবিচন্দ্র।
- রামানন্দ ঘোষ।
- জগদ্রাম।
- রঘুনন্দন গোস্বামী।

এছাড়া কৈলাস বসু, ফকিররাম কবিভূষণ, দ্বিজ লক্ষণ, রামশঙ্কর দত্ত, হরেন্দ্র নারায়ণ, দ্বিজ দয়ারাম, দ্বিজ সীতামৃত প্রভৃতি কবির রচিত আংশিক রামায়ণ অনুবাদ বিভিন্ন সময় লক্ষ করা যায়।

৩.৪.২ মহাভারত

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

বাংলায় অনূদিত মহাভারতের আদি কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে তেমন তথ্য না পাওয়া গেলেও জানা যায়, বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁর সভাকবি ছিলেন পরমেশ্বর। 'কবীন্দ্র' ছিল তাঁর উপাধি, যা পরাগল খাঁ কবিকে দিয়েছিলেন। সুলতান হুসেন শাহের মতো পরাগল খাঁও ছিলেন কাব্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী ও হিন্দু সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত। লোকমুখে মহাভারতের বিচ্ছিন্ন কাহিনি শুনে পরাগল খাঁর সমগ্র মহাভারতের আখ্যান শোনার ইচ্ছে হয়। তাই তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে বলেন—

'এই সব কথা কহ সংক্ষেপে করিয়া।
দিনেক শুনিতে পারি পাঁচালি রচিয়া।।'

চট্টগ্রাম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে পরমেশ্বর মহাভারতের কাহিনি অতি সংক্ষিপ্ত আকারে রচনা করেন। তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'পাণ্ডব বিজয়' বা 'ভারত পাঁচালী'। পয়ার ত্রিপদী ছন্দে কবি ১৪৯৩ খ্রি. থেকে ১৫১৮ খ্রি. কোন এক সময়ে কাব্যটি রচনা করেন। গ্রন্থটি 'পরাগলি মহাভারত' নামেও পরিচিত। তত্ত্বকথা পরাগল খাঁকে মনোরঞ্জন করতে পারবে না বলে পরমেশ্বর শুধু কাহিনি অনুসরণ করে মূল্যবান তত্ত্বকথাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীকর নন্দী

চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নসরত খাঁ (ছুটি খাঁ) পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর নির্দেশে শ্রীকর নন্দী 'জৈমিনি মহাভারত' অবলম্বনে শুধুমাত্র 'অশ্বমেধ পর্ব' রচনা

করেন। তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক। কবিত্ব শক্তির দিক থেকে কবি পরমেশ্বর অপেক্ষা শ্রীকর নন্দী অনেকটাই শক্তিমান। হাস্যরসের প্রকাশে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসামান্য।

এছাড়া কবি সঞ্জয়ের মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারতের কথাও আমরা জানি। কোন কোন সমালোচক আবার পরমেশ্বরের কাব্যকেই সঞ্জয়ের মহাভারত বলেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার পূর্বে ও পরে বেশ কিছু খণ্ডিত ও আংশিক মহাভারত রচনার তালিকা দিয়েছেন। যার মধ্যে অন্যতম হল—

- নসরত শাহের আদেশে সংকলিত 'ভারত পাঞ্চালি'।
- সঞ্জয়ের মহাভারত – আদি থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত।
- কবীন্দ্র পরমেশ্বরের – আদি থেকে অশ্বমেধ পর্ব।
- বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত - আদি থেকে অশ্বমেধ পর্ব।
- শ্রীকর নন্দীর - অশ্বমেধ পর্ব।
- দ্বিজ অভিরামের - অশ্বমেধ পর্ব।
- কৃষ্ণানন্দ বসুর মহাভারত – শান্তি পর্ব।
- অনন্ত মিশ্রের জৈমিনি ভারত - অশ্বমেধ পর্ব।
- নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত – আদি, সভা, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, স্ত্রী ও শান্তি পর্ব।
- দ্বিজ রামচন্দ্র খানের - অশ্বমেধ পর্ব।
- দ্বিজ কবিচন্দ্রের মহাভারত।
- উৎকল কবি সারণের – আদি, সভা ও বিরাট পর্ব।
- ষষ্ঠীবরের - ভারত।
- গঙ্গাদাস সেনের - আদি ও অশ্বমেধ পর্ব।
- রাজেন্দ্র দাসের – আদি পর্ব।
- গোপীনাথ দত্তের – দ্রোণ পর্ব।
- রামেশ্বর নন্দীর – মহাভারত।
- কাশীরাম দাসের – মহাভারত।
- কাশীদাসের পুত্র নন্দরাম দাসের – ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ পর্ব।
- ত্রিলোচন চক্রবর্তীর – মহাভারত।
- নিমাইদাসের – মহাভারত।
- দ্বৈপায়ন দাসের – দ্রোণ পর্ব।
- বল্লভদেবের – ভারত।
- দ্বিজ কৃষ্ণরামের - অশ্বমেধ পর্ব। ইত্যাদি

কাশীরাম দাস (দেব)

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস। খ্যাতি, জনপ্রিয়তা ও প্রতিভা-শক্তির দিক দিয়ে কাশীরাম দাস ছিলেন কৃত্তিবাসের সমকক্ষ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালি ঘরে সমাদৃত কাশীরাম দাসের 'ভারত পাঁচালী'। কাশীরাম দাস সম্পর্কে মাইকেল মধুসূদনের উক্তিও যথার্থ—

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।। '

কাশীরাম দাস বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা অন্তর্গত সিঙ্গি বা সিদ্ধি গ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকান্ত। কবিরা তিন ভাই ছিলেন- কৃষ্ণকান্ত, কাশীরাম ও গদাধর। কাশীরামের পদবী ছিল 'দেব', পরে বিনয়বশত দেবের স্থানে 'দাস' ব্যবহার করেছেন।

গদাধরের 'জগৎমঙ্গল' থেকে আমরা জানতে পারি, কাশীরাম দাস মেদিনীপুর জেলার আত্রাসগড়ের রাজার বাড়িতে শিক্ষকতার কাজ করতেন। এছাড়া কোন কোন পুঁথি থেকে জানা যায়, কাশীরাম দাস হরিহরপুরের অভিরাম মুখুটীর আশীর্বাদে এবং নির্দেশে 'ভারত পাঁচালী' রচনা করেন—

'হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণ ধাম।

পুরুষোত্তম-নন্দন মুখুটী অভিরাম।।

কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্বাদে।

সদা চিত্ত রহে যেন পাদ্মপদে।।'

কবির আবির্ভাব ও কাব্য রচনার কাল নিয়েও বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ করা যায়—

- কবির ছোট ভাই গদাধর দাস 'জগৎমঙ্গল' (১৬৪২-৪৩) কাব্য রচনা করেন, যেখানে কাশীরামের উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় কাশীরামের কাব্য 'জগৎমঙ্গলের' আগেই রচিত।
- সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কাশীরামের একটি পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাঁর কাব্য ১৬০৪ খ্রি. রচিত।
- বিভিন্ন পণ্ডিতদের অভিমত, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে; আবার কেউ কেউ বলেন সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় কাশীরাম দাসের রচনাকার্য সমাপ্ত হয়েছে।
- অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারতের উপসংহারে লেখা আছে—

'আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।

ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।।'

সুতরাং অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন, কাশীরাম সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেননি। কবি আদি, সভা এবং বনপর্ব সমাপ্ত করেন। অসম্পূর্ণ বিরাটপর্ব কবির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা রচনা করেন।

অনুবাদ কর্মে কৃত্তিবাসের মতো মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না করলেও কাশীরাম দাস কোথাও কোথাও ভাবানুবাদ, সারানুবাদ করেছেন। সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই তত্ত্বকথা, নীতিকথা বাদ দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করেছেন। ফলত তাঁর 'ভারত পাঁচালী'-তে বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ ও জৈমিনি মহাভারতের কিছু কিছু আখ্যান স্থান পেয়েছে। কৃত্তিবাসের মতো পাঁচালী রচনা করলেও কাশীরামের 'ভারত পাঁচালী' তৎসম শব্দ, ধ্রুপদী তানের গাম্ভীর্য, পয়ার-ত্রিপদী ছন্দের বাঁধন, অলংকার ইত্যাদি সব মিলে বাংলা কাব্যজগতে জনপ্রিয় আসন লাভ করে আছে।

৩.৪.৩ ভাগবত

মালাধর বসু

মধযুগে রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদের পাশাপাশি একখানি পুরাণেরও অনুবাদ হয়েছিল– 'শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ'। তুর্কি বিজয়ের পরে বাংলায় আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির মিলনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী লীলারস আস্বাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে বাঙালি জাতির মর্মে। শুধু বাংলা নয়, ভারতের যে-কোনো প্রাদেশিক সাহিত্যে মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ প্রথম, সেই অর্থেই তিনি ভাগবতের অনুবাদ ধারায় আদিকবি।

'ভাগবত'-কে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের উপনিষদ তথা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা হয়। মালাধরের পৌত্র রামানন্দ মহাপ্রভুর সেবক ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁকে চোখে দেখেননি, কিন্তু বিশেষ সম্মানের আসনে মালাধর বসুকে রাখতেন। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেব মালাধর বসুর বাসভূমি ও গ্রামবাসীকেও সম্মান জানাতেন, তার পরিচয় লক্ষ করা যায় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে—

'তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর।।'

বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত মেমারি রেল স্টেশনের পাশে কুলীনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভগীরথ, মায়ের নাম ইন্দুমতী। মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের দরবারে উচ্চ কর্মচারী পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর জন্য গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে তিনি 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেন—

'গুণ নাই অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।'

সংস্কৃতে রচিত অষ্টাদশ পুরাণ ও ছত্রিশ উপপুরাণের মধ্যে 'ভাগবত' অন্যতম। ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত; এতে ৩৩২ টি অধ্যায় এবং ১৮০০০ শ্লোক রয়েছে। মালাধর বসু ভাগবতের কেবল দশম ও

একাদশ স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন। দশম স্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলার পুরোপুরি এবং একাদশ স্বন্ধের কাহিনির যৎসামান্য তথা কৃষ্ণের তনুত্যাগ এবং যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনি মালাধর বসু অনুবাদ করেছেন। এছাড়া ভাগবত বহির্ভূত বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনি অনুসরণে বৃন্দাবনলীলা, রাসলীলা, নৌকালীলা ও দানলীলা অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কেদারনাথ দত্ত সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' –এর মুদ্রিত সংস্করণে গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।

চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।'

অর্থাৎ ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দের (১৪৭৩-১৪৮০ খ্রি.) মধ্যে তিনি কাব্যটি রচনা করেন। মালাধর বসুর অনুবাদের তাৎপর্যগুলি—

- মালাধর বসু ভাগবতের দশম স্কন্ধ এবং একাদশ স্কন্ধের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া ভাগবত বহির্ভূত বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনি অনুসরণে বৃন্দাবন লীলা, রাসলীলা, দানলীলা ও নৌকালীলা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রণয়লীলাও তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।
- কবি তাঁর কাব্যটিকে তিনটি ধারায় কাহিনি বিন্যাস করেছেন- বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা।
- মালাধর বসু মূল ভাগবতের হুবহু অনুবাদ না করে মর্মানুবাদ করেছেন।
- মালাধর বসু মূলত ভক্ত, দ্বিতীয়ত কবি। তাই কৃষ্ণের মাধুর্য লীলার কথা বললেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপকে তাঁর অনুবাদে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।
- অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর ভাগবতের বিষয়কে পয়ার ত্রিপদী ছন্দে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন- 'লোক নিস্তারিতে গাহি পাঁচালী রচিয়া।'
- তাঁর কাব্যে কবিত্বময় বর্ণনা কিংবা শিল্পচাতুর্যের প্রকাশ দুর্লক্ষ্য। কিন্তু সহজ, সরল, নিরলংকৃত ভাষায় কৃষ্ণের ঐশী শক্তির বর্ণনাই ছিল তার মুখ্য পরিকল্পনা।
- ঐতিহাসিক পটভূমিতেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা। কারণ সেদিনের দুর্বল, পরাজিত, হতমান জাতির আন্তরিক আকাঙ্খাই ছিল এক গৌরবময়, বলবীর্যময় অতীত কাহিনির আস্বাদন, যার মধ্যে যুগাবতারের আবির্ভাবের আশ্বাস লক্ষ করা যায়।
- কাব্যসমাপ্তিতে কবি যুগধর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

'মেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম পালিব।

জার ধন দেখিব তার সব হরি লব।।'

তৎকালীন সমাজে পাঠান শাসনকালের সামাজিক বিশৃঙ্খলা এই উক্তির মধ্যেই স্পষ্ট।

কবির শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে ভক্তি লক্ষ করা যায়, তা ভাগবতে বর্ণিত বৈধীভক্তি, আত্মনিবেদনমূলক গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তি নয়, বরং প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাধারণ ভক্তি। তাই তিনি তাঁর কাব্যে বলেছেন—

'কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন একমনে।
কলি ঘোর তিমির করিত বিমোচনে।।
হেন যথা শুনিবারে না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই মাত্র ভেলা।।'

ভাগবতের কৃষ্ণ চরিত্রের হুবহু দিক তুলে না ধরে সমকালীন জীবনের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পরিমিতিবোধের সঙ্গে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার দিকটিই বেশি প্রকাশ করেছেন মালাধর বসু। এই কৃষ্ণ যেমন বীরত্বে অপরাজেয় তেমন প্রেমে মাধুর্যময়। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বাঙালির জীবন প্রকৃতির পরিচয় রয়েছে এবং তাই কাব্যটি বাঙালির প্রিয়। বাংলার রীতি-নীতি, পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবনের খাদ্য-সামগ্রীর স্বাদ প্রভৃতি তাঁর কাব্যে সুন্দর ভাবে চিত্রিত।

কাবাটিতে যে নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' বাক্যটি রয়েছে, যা চৈতন্যদেবকে মুদ্ধ করেছিল। এই বাক্যের 'প্রাণনাথ' শব্দটি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব ভক্তদের মনে রাগানুগাসাধনার আভাস দান করেছিল বলে অনুমান করা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজও শ্রীচতন্যচরিতামৃতের এক জায়গায় বলেছেন-

'কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়।।'

সুতরাং মালাধর বসু ভাগবতের শক্তিমান অনুবাদক না হলেও, মৌলিক কল্পনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সহজ সরল রচনা রীতিতে ও কাহিনি বর্ণনার মাধুর্যে এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ভক্তের রচিত প্রথম কাব্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলাদেশে সমাজ ও সাহিত্যে যে নবজাগরণ শুরু হয়, তার কিছুটা আভাস এই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' রয়েছে। এখানেই সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলা হয়েছে- 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'। এখানে পরবর্তী যুগের রাগানুগা সাধনার ইঙ্গিত মেলে।

প্রাক-চৈতন্য যুগে মূলত কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্যের দিকটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিত্রিত হলেও চৈতন্যযুগে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে কৃষ্ণলীলার মাধুর্যের দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য যেহেতু রাধাভাবে ভাবিত তাই ভাগবতের অনুবাদকগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের অন্তরালে বংশীবদন মূর্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ষোড়শ শতকে ভাগবত অনুবাদক হিসেবে তিন জনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা স্মরণ করতে পারি। এঁরা হলেন-ভাগবতাচার্য রঘুনাথ, মাধবাচার্য এবং দুঃখী শ্যামদাস।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাগবতের অনুসরণে ও অনুবাদের রীতিতে রচিত কাব্যগুলি উৎকৃষ্ট না হলেও সংখ্যায় কম নয়। এইসব অনুবাদকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুই একটি স্কন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন,

নিজের মতো আখ্যানকে সাজিয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা তত্ত্বকথাকে বাদ দিয়ে নিজেদের মতো কাহিনিকে সাজিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণ, উপপুরাণ থেকেও কাহিনি সংগ্রহ করেছেন। আবার লৌকিক কাহিনিকেও অনেকক্ষেত্রে সংযুক্ত করেছেন। এঁরা হলেন- সনাতন বিদ্যাবাগীশ, দ্বিজ হরিদাস, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণকিঙ্কর, অভিরাম দত্ত (দাস), দুর্লভনন্দন, কবিচন্দ্র প্রভৃতি।

প্রতিভাবান অনুবাদকের অভাব থাকলেও সপ্তদশ শতাব্দীর মতো অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বেশ কিছু ভাগবত অনুবাদকের পরিচয় পাওয়া যায়। যার মধ্যে অনেকেরই পূর্ণাঙ্গ রচনা একাধিক পাওয়া গেছে। এই অনুবাদগুলি গতানুগতিক, তবে কিছু অনুবাদকের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা হলেন- শঙ্কর কবিচন্দ্র, বলরাম দাস, দ্বিজ মাধবেন্দ্র, দ্বিজ রমানাথ প্রমুখ। এঁরা মূল ভাগবতের কৃষ্ণলীলাসংক্রান্ত অধ্যায়গুলি সংক্ষেপে রচনা করেছেন। পাশাপাশি কিছু কিছু ভাগবত বহির্ভূত কাহিনিও সংযোজিত করেছেন এবং নিজের মতো করে কিছু কাহিনি উপস্থাপন করেছেন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। বাংলায় প্রতিনিধিস্থানীয় অনুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৩.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা—

- অনুবাদ সাহিত্যের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানলাম।
- অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে ধারণা পেলাম।
- বাংলায় প্রতিনিধিস্থানীয় অনুবাদ তথা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কবিদের অনুবাদ সম্পর্কে অবগত হলাম।

৩.৬ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ।

৩.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের চাহিদা ছিল একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা, উপদ্রপহীন ভাবে জীবন নির্বাহ করা এবং ধর্ম-কর্মে মন স্থির রাখা। সংস্কৃত কাব্য-মহাকাব্য এবং পুরাণ অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা অনুবাদ সাহিত্য উচ্চতর মর্যাদা লাভ করে। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৩ অংশ)

২। বাঙালি সমাজের পুনর্গঠনের জন্য এমনকি বাঙালি ঐতিহ্যের সর্বভারতীয় প্রাণধারার সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ প্রয়োজন ছিল। অবশ্য লক্ষণীয়, বাংলার অনুবাদ সাহিত্যে হুবহু আক্ষরিক অনুবাদের রীতি খুব বেশি একটা গৃহীত হয়নি। কবিগণ মূল গ্রন্থকে সংক্ষেপে নিজের ভাষায় পয়ার ত্রিপদীতে রচনা করেছেন। ফলত স্বল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ খুব সহজেই পৌরাণিক ঐতিহ্য ও তার ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। তাই বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পূর্ণ পরিণতির জন্য অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা এতটা গুরুত্বপূর্ণ।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৪)

৩.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। অনুবাদ চর্চার ইতিহাস লিখুন।
২। বাংলায় প্রতিনিধিস্থানীয় অনুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩। কৃত্তিবাস ওঝার ব্যক্তিজীবন ও তাঁর রামায়ণ অনুবাদের পরিচয় দিন।
৪। বাংলায় মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে? তাঁর জীবনী ও কাব্য-প্রতিভা আলোচনা করুন।
৫। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর কাহিনির উৎস ও রচনাকাল উল্লেখ করে কবি প্রতিভার পরিচয় দিন।
৬। টীকা লিখুন – শ্রীকর নন্দী পরাগলী মহাভারত।

*** *** ***